Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 095-102
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

নৈতিকতা ও অর্থনীতি

গীতা রানী দাস*

"নৈতিকতা ও অর্থনীতি"-র মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিক সম্পর্ক নেই। বরং, একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনৈতিক ব্যবহার শুধু সমাজে নয়, সর্বত্র তা ধ্বংসের কারণ। তাই অর্থনৈতিক উপকরণগুলো সক্রিয় রাখতে অনৈতিক নীতিমালা দিয়ে এগুলোকে কলুষিত না করা শ্রেয়। নৈতিক কার্যক্রমের কারণে একজন মানুষ পূণ্য অর্জন করে যা' তার মূল্য বাড়িয়ে দেয়। সম্পদ, সুনাম, ভালোবাসা ও স্বাধীনতা ইত্যাদি দিয়ে মানুষের মূল্য বিচার্য। Ethics হলো principles of morality–এই একটি জিনিষের অভাবই মূলত শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর জাতিসমূহের সম্পদের অপচয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ।

অর্থনীতিবিদরা যখন পুঁজিবাদ, লাভক্ষতি, প্রতিযোগীতা ইত্যাদি ধারণা নিয়ে ব্যস্ত তখন নীতিবানরা ভালো, উত্তম প্রিয়পাত্র হতে চেষ্টা করেন। তাই মূল্যবোধসম্পন্ন উত্তম এবং মূল্যবান লোককে অনুসরণ করা যৌক্তিক। যত বিভেদই থাকুক, অর্থনীতি, যশ, ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে ethical issues গভীরভাবে সম্পৃক্ত। জবাবদিহিতা, দৃষ্টিভংগী ও চিন্তা-চেতনায় যে যত স্বচ্ছ সে তত মূল্যবান জিনিসকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। যেহেতু ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ এবং সমাজকে নিয়ে দেশ ও পৃথিবী তাই অর্থনীতির নৈতিক উপকরণগুলোকে সচল রাখার মাধ্যমে কিভাবে সমাজে নিজের অবস্থান ও মূল্য উন্নত করা যায় অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কিভাবে নিজের অর্জিত সম্পদ নিজের ভোগ ব্যয়ে নিঃশেষিত না করে অন্যের জন্য কিয়দংশ হলেও ত্যাগ করে।

স্বয়ংক্রিয় উপায়ে সব মানুষের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায় না বলে সরকারি নীতিমালার মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। তবে অনুদান প্রদান বা প্রকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা প্রদর্শন অধিক কাম্য ও যৌক্তিক। তাই অর্থ যেন কোনভাবেই অনৈতিক কাজে ব্যয়িত না হয় সেই বিষয়টি দেখা প্রয়োজন। একজন সৎ, আর্থিকভাবে পঙ্গু ব্যক্তিকে সাহায্য করা আর একজন উচ্ছৃঙ্খল, সন্ত্রাসী, নেশায় বুদ হয়ে থাকা অলস ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করা এক হতে পারে? যেমন এক ব্যক্তি তার অর্জিত সম্পদের অর্ধেক তার নিজ সংসার অর্থাৎ স্ত্রী-সন্তান ও নিজের জন্য ব্যয় ছাড়াও বাকী অর্ধেক এর বাইরে খরচ করতো; যে বিষয়ে কোনো জবাবদিহিতা থাকতো না। তার পথভ্রষ্টতার কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও পথভ্রষ্ট হতে হয়। ফলে প্রতিযোগীতামূলকভাবে অর্থ-সম্পদের অপচয়ের কারণে পরিবারটির কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হয় না। এ বিষয়েও সরকারের স্বচ্ছ নীতিমালার প্রয়োজন অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তিটির

* বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আজীবন সদস্য

আয় ব্যয়ের উৎস, আয়কর প্রদান ছাড়াও শতকরা কত ভাগ "করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি"-তে ব্যয় করবে তার উপর। একটি পরিবারের জন্য শতকরা হারের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বাইনারী পদ্ধতি যেমন: ০১০১০১ অর্থাৎ স্বামীর পক্ষের লোকের জন্য ১ টাকা ব্যয় হলে তা হবে স্ত্রীর পক্ষের লোকের জন্য এক টাকা ব্যয়। এটা হলো পরিবারভিত্তিক CSR কৃত অর্থের নৈতিক বণ্টন ব্যবস্থা।

নৈতিকতার বৈশ্বিক সংজ্ঞা থাকলেও দেশে-বিদেশে এর প্রায়োগিক সংজ্ঞা ভিন্ন। যেমন: একটি দেশে মদ উৎপাদন ও পান করা নিষিদ্ধ আবার অন্য দেশে তা সেবন অত্যাবশ্যক হতে পারে। তাই, নৈতিকতার সংজ্ঞা ও প্রয়োগ সব বিষয়ে সব দেশে অভিন্ন হতে পারে না। আবার একটি দেশের বা জাতি-গোষ্ঠীর জন্য মদ-গাঁজা নিষিদ্ধ হলেও দক্ষ শ্রম শক্তির কারণে সে সব দেশে মদের উৎপাদন খরচ কম হতে পারে এবং উৎপাদিত পণ্য দেশে ভোগ না হয়ে বিদেশে রপ্তানী করা যেতে পারে। এখানেও নৈতিকতার বিষযটি একটু ভিন্ন আঙ্গিকের। অর্থাৎ রয়েছে বেকারত্ব দূরীকরণ ও উৎপাদন খরচ কমানোর নৈতিক দিক। একজন মহিলা যিনি ৪০ বছর বয়সে ১০ লাখ টাকার মালিক এবং অবসরজীবনে ভ্রমণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। আবার অন্য একজন মহিলা যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ১০ লাখ টাকার মালিক যখন তার বয়স ৪০, তখন ঐ অর্থ থেকে তিনি কল্যাণমূলক কাজে দান করেন ৯.৯ ভাগ, তাহলে কে সবার কাছে প্রশংসনীয়? অবশ্যই দ্বিতীয় জন।

জন্মগতভাবে মানুষের চরিত্র, আকার, অভ্যাস, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক গঠনও ভিন্ন। খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পরিমাণও ভিন্ন। আবার পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণেও দেখা যায় ব্যবহারিক প্রয়োগের ভিন্নতা। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় বিদ্যমান পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রতিযোগীতা করার সক্ষমতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ভূগর্ভস্থ সম্পদের প্রাচুর্যতা/দুষ্প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা ইত্যাদির ভিত্তিতে ethical অর্থনীতি গড়া অধিক গ্রহণীয়। তবে তিনটি মৌলিক বিষয় পৃথিবীর সব দেশ ও সব ধরনের কর্মকাণ্ডে গ্রহণযোগ্য তা হলো: ভালোবাসা, স্বাধীনতা ও সম্পদ। এগুলোর চাহিদা বিশ্বব্যাপী সমান।

নৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দিকটিও মূখ্য। রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকারের গঠনপ্রকৃতি, ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক আদর্শ/অন্যান্য দলের মেনিফেস্টো ইত্যাদি বিষয়গুলোও একটি দেশের অর্থনীতিকে Ethical standard এ উন্নীত করতে সমভাবে কার্যকর। রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার নীতি নির্ধারক মহলের বিবেচনায় যে বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া উচিত মনে হবে তাই হবে দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা। যেমন: মুদ্রানীতি প্রণয়ন, বাজেটের মাধ্যমে সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা নিরূপণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে সম্পর্কোন্নয়ন, করারোপ, আর্থিক নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা।

অবশ্যই কোনো বিশেষ এলাকার অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গিয়ে "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হচ্ছে কিনা? (২) যেসব মেধা, প্রতিভার বিকাশে সমাজ আলোকিত তাদের যথার্থ মূল্যায়ন হচ্ছে কিনা? ভালো-মন্দের ঐশ্বরিক বিচার সময়সাপেক্ষ বলেই প্রতিটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিরূপণ, নিরীক্ষণ, ঘটনার নিয়মতান্ত্রিকতা যাচাইকরণ এসবই নৈতিক অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের উপকরণ।

নৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বিভিন্ন সময়কালের অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অধ্যাপক মার্শাল অর্থনীতিকে নীতিবাচক বিজ্ঞান এবং অধ্যাপক এল রবিনস অর্থনীতিকে একটি ইতিবাচক বিশুদ্ধ ও সার্বজনীন বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত

করেছেন। তাদের সংজ্ঞায় মানুষের কল্যাণ প্রাধান্য পেয়েছে। এতে ব্যবস্থাপনার দিকটি উঠে এসেছে। সমাজে কুকর্মে সম্পৃক্ত করা সম্ভব এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। অন্যদিকে, ভালো কাজ করার মতো লোকের সংখ্যা বেশি হলেও তারা পরিস্থিতির স্বীকার। উপরন্তু রয়েছে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল, আদর্শগত বিভেদ। এসব বিষয়কে "সমন্বয় ও জবাবদিহিমূলক" অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সার্বজনীনভাবে গড়ে তোলাই শ্রেয়। অনেকে যেমন কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার সাথে নৈতিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য এক করতে চেয়েছেন। মুক্ত অর্থনীতির পূর্ণ প্রতিযোগীতায়, পুঁজিবাদের উপস্থিতি, কোনোটির সাথেই নৈতিকতার সংঘর্ষ নেই। এখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, মোটামুটি ভালোভাবে বেঁচে থাকার মতো শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ পরিবেশের ব্যবস্থা করা, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা, কর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলে বলা যায় নৈতিকতাপূর্ণ অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই নৈতিকতা সংরক্ষিত হতে পারে মিশ্র অর্থব্যবস্থায়ও। শুধুমাত্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়ই যে নৈতিকতা সংরক্ষিত হবে এমন কোন কথা নেই। উল্লেখ্য, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সমাজের সব ব্যক্তিকে যদি আয় করের আওতায় আনা যায় তবে সিএসআর এর প্রয়োজন **কমে আসে**। আয়ের উৎস সম্পর্কে জবাবদিহিতা নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ত্বরান্বিত করতে পারে। অর্থ অপচয় ও ভোগ ব্যয়েও থাকতে পারে ব্যাপক ব্যবধান। যার তুলনামূলক পর্যালোচনার সুযোগ কম। সমাজে সিএসআর-এ সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও অত্যন্ত সীমিত। তাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বা সরকার প্রণীত আইনসিদ্ধ নীতিমালা দিয়েই তৈরী হওয়া উচিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী টার্গেট গ্রুপ বা সিন্ডিকেটেড গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করা না গেলে তথ্যের গোপনীয়তায় অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থনীতিবিদ পিগু এর মতে, মানবকল্যাণ ত্বরান্বয়নে অর্থনীতি নীতিশাস্ত্রের ভৃত্যস্বরূপ। নৈতিক অর্থনীতি কখনোই অকল্যাণকর কর্ম উদ্দীপনার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো অর্থনীতিশাস্ত্রেরও কতগুলো মৌলিক ধারণা রয়েছে:

দ্রব্য: যা 'বস্তুগত ও অবস্তুগত' (যেমন: গায়কের গান, কবি প্রতিভা ও ব্যবসায়ীর সুনাম)। এ ছাড়াও রয়েছে ভোগ্য দ্রব্য বা মূলধন দ্রব্য ইত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট দেশের জন্য যা নীতিগতভাবে আইনসিদ্ধ সেসব দ্রব্যই নৈতিক অর্থনীতির আওতাভুক্ত।

সম্পদ: সম্পত্তি ও মানব সম্পদ। সম্পদ বৈশিষ্ট্য চারটি। যেমন উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা, বাহ্যিকতা। তবে সৎ উপায়ে অর্জিত এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ সম্পদই হলো নৈতিক সম্পদ। সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান। সম্পদ কল্যাণের উৎস। সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে কিনা তা সম্পদের উৎপাদন বণ্টন ও ভোগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। একটি দেশের অর্থনীতিকে আরো বেশী নৈতিক করতে কি কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা মূলত সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের সিদ্ধান্তের বিষয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত যেমন: পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। কোনে কোনো দেশে একটি বিশেষ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। আবার কোথাও কোথাও মিশ্র ব্যবস্থাকেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে। তবে যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন উৎপাদন ও ভোগকার্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজারব্যবস্থার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সংমিশ্রণ নৈতিক হওয়া উচিত। যেমন: আমাদের মতো দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থাই অধিক নীতিসিদ্ধ। তবে এতে অন্তর্কোন্দল বাড়ে।

একটি স্বাধীন দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি মূলত উৎপাদন। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করে কি পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত পণ্য উৎপন্ন হয় তার মোট মূল্য হলো একটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন। ঐ পণ্য নৈতিক কিনা তা নির্ভর করে উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন উপকরণের নৈতিক ব্যবহারের উপর। তাই উৎপাদনের চারটি উপকরণের কার্যাবলী বিশ্লেষণেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসে।

১. ভূমিঃ ভূমি ব্যবহারে নৈতিকতা অত্যন্ত জরুরি। ভূমি ব্যবহারে সন্ত্রাসীদের লীলাক্ষেত্র রূপে ভূমির ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়াও এমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না বা এমন কিছু শিল্প কলকারখানা স্থাপন করা যাবে না যার ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ূ দুষণের কারণে মাটির উর্বরতা বিনষ্ট হয়ে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পরিকল্পিতভাবে বনজ সম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ তীব্র দাবাদহের কারণে অনেক স্থানে আগুনে ভস্মীভূত হতে দেখা যায়। এটাও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রতি ঘনফুটে জনবসতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। যেসব কলকারখানার বর্জ্য পদার্থে নদ-নদীর পানি দুষিত হয়ে এলাকাবাসীর জীবন যাপন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে সেসব বিষয় নৈতিক নীতি নির্ধারক মহলের/অর্থনীতিবিদদের চিন্তায় ও মননশীলতায় প্রধান্য পাওয়া উচিত। কি পরিমাণ জমি কৃষি খাত, কতটা আবাসভূমির জন্য ব্যবহার কতটা শিল্পে ব্যবহার, কতটা বাণিজ্য ও যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা উচিত তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত। কতটা জমি সরকারি খাতে আর কতটা বেসরকারি খাতে থাকবে তারও রূপকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২. শ্রম : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের শ্রম, মেধার যৌক্তিক ব্যবহারে ভূমি এবং মূলধনকে উৎপাদন কাজে লাগানো যায়। মানুষের মেধা যদি মানুষের মঙ্গলার্থে কাজে লাগানো না যায় তবে সেই মেধার কোন মূল্য নেই। আবার শ্রমিক যদি শ্রমের যথাযথ মূল্য না পায়, প্রকৃত আয়কে বিবেচনায় আনা না যায় এবং বীমা সুবিধাসহ অনান্য সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না যায় তবে অবশ্যই শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তা প্রতিকুল। এছাড়াও দরকষাকষির এজেন্ট হিসাবে ক্ষমতা প্রদান তার মধ্যে অন্যতম। যেসব শ্রমিক দৈনিকভিত্তিতে কাজ করে এবং যাদের কোনো উৎসব ভাতা প্রদানের বিধান নেই তাদের মজুরীও অন্যন্যদের তুলনায় বেশি হওয়া বাঞ্চনীয়। কাজের প্রকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ীও শ্রম নির্ধারিত হওয়া উচিত। যেসব সৃজনশীল বুদ্ধি মানব কল্যাণে ও নতুন নতুন আবিষ্কারে সম্পৃক্ত সেসব শ্রম অধিক মূল্য পাওয়ার যোগ্য। তীব্র দাবদাহে কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরী আর এয়ার কন্ডিশনে বসে কর্মরত শ্রমিকের মজুরী কি এক হওয়া বাঞ্ছনীয় নাকি নৈতিক?

৩. মূলধনঃ মূলধন মানুষের উৎপাদিত সম্পদ। মানুষের বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে মূলধন পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। শ্রমিকের কায়িক শ্রম লাঘবের জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং শ্রমিকের মোট উৎপাদনের কতটুকু মূলধন গঠনে ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারণ এবং উৎপাদন খরচ মিটানোর জন্যও মূলধন প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই মূলধনের প্রয়োজন। সরকারি কর ব্যবস্থা, ঘাটতি বাজেট, বিদেশী বিনিয়োগ, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, মুদ্রানীতি, সুদের হার, শেয়ার ব্যবসা, সরকারি বিল বন্ড ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন উল্লেখ্য। উন্নত দেশগুলোতে মূলধন গঠনে নিয়মনীতি অনুসৃত হলেও অনুন্নত দেশে তা হয় না। কারণ মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, নিরাপত্তার অভাব, জনগণের দূরদৃষ্টির অভাব, বাজারের সীমাবদ্ধতা, পণ্যের গুণগত মান ও

বাজারের সীমাবদ্ধতা, দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, সম্পদ বণ্টনে অনৈতিকতা, রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, ব্যাংক সুদের হার ইত্যাদি। কস্ট বেনিফিট হিসাব করে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঠিক কতো পরিমাণ মুলধন গঠনে ব্যয় করা উচিত তা নির্ধারণ করা যৌক্তিক। অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠন কাম্য পর্যায়ে না থাকায় যৌথ মূলধনী কারবারের ধারণা বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির জন্য। তবে ঐ মূলধন সংগ্রহ ও ব্যবহার কতটা নৈতিক তা বিচার-বিশ্লেষণ করা উদ্যোক্তা ও সরকারের কাজ। ব্যবহৃত মূলধন দীর্ঘ মেয়াদে লাভ আনবে নাকি স্বল্পমেয়াদে লাভ আনবে তার খরচ-মুনাফা হিসাব করা অত্যাবশ্যক।

৪. সংগঠন: একটি দেশের জন্য কি ধরণের প্রতিষ্ঠান কাম্য তা বিবেচনার দায়িত্ব উদ্যোক্তার। উৎপাদনের সব উপকরণ পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার দায়িত্ব সরকার বা উদ্যোক্তার। উদ্যোক্তা নিজেই নির্ধারণ করবে কি কি ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কোন ধরনের ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে। যেখানে শুধু লাভ-ক্ষতির হিসাব অনেক সময় প্রাধান্য পাবে না, বরং অস্তিত্বের বিষয়টিও প্রাধান্য পাবে। প্রতিষ্ঠানটি এক মালিকানা, অংশিদারী, যৌথ মালিকানা, সমবায় নাকি সম্পূর্ণভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হলে নৈতিকতা বজায় রাখা যায় তা নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের। তবে সরকার পরিচালনায় নিযুক্ত রাজনৈতিক দলের আদর্শ যদি স্বৈরাচারী হয় তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও স্বৈরাচারে পরিণত হয়। তথ্যের গোপনীয়তার মাধ্যমে হিসাববিহীন অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে জনদুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলে। বিপরীত অবস্থায় মুক্ত মনের বিকাশ ঘটে, বিচারব্যবস্থা নৈতিক হয় এবং সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরে আসে। শ্রম ও মূলধনের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। অবাধ বাণিজ্যনীতির মতো পরিবেশ সৃষ্টির ফলে সুবিধা অনুযায়ী সব ধরণের প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিরাজ করে। শ্রমের গতিশীলতায় উৎপাদন বেড়ে অর্থনীতির চাকা সচল হয়। সরকার যদি স্বৈরাচারী বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শপুষ্ট হয় তবে ব্যবসা সংগঠনগুলো অংশিদারী, সমবায়ভিত্তিক বা যৌথ মূলধনী কারবার হওয়া উচিত। সরকার যদি গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত হয় তবে একচেটিয়া কারবারসহ উল্লিখিত বিভিন্ন সংগঠন ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। অবশ্যই সরকার ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর মতবিনিময়ে নৈতিক ব্যবসার নিয়মনীতি নির্ধারিত হবে।

৫. বাজার ব্যবস্থা: অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না, বরং এক বা একাধিক পণ্যকে বুঝায় যা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগীতার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়। উন্নত ও অনুন্নত দেশের বাজারব্যবস্থা একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নাও হতে পারে। এটা নির্ভর করে ক্রেতাদের শিক্ষা সচেতনতা, দেশাত্মবোধ, বিক্রেতাদের নৈতিকতা, মূলধনের উৎস, সরকারি নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। সর্বোপরি, সরকারের পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণও মুখ্য বিষয়। আইনের মাধ্যমে বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগীদের ক্ষমতা সংরক্ষণ করা না যেতে পারে। তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অথচ সম্পদশালী দেশের জন্য "নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগীতামূলক" ব্যবস্থা অধিক কাম্য। আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে শুল্ক, ট্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব। দেশীয় উৎপাদনের তুলনায় আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য কম হওয়া সত্বেও বেকার সমস্যা দূরকরণে দেশীয় শিল্পকে প্রণোদনা দেয়া বেশি নৈতিক বলে বিবেচ্য। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারিত হয়। অলিগোপলি, ডুওপোলি ও একচেটিয়া বর্তমানে নেই বললেই

চলে। কোন বিশেষ পণ্যের জন্য একচেটিয়া বাজার থাকতে পারে আবার কতিপয় পণ্যের জন্য "অলি" ও "ডুও" থাকতে পারে। পাশাপাশি সরকার নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থারও প্রচলন থাকতে পারে। মোটামুটি উভয় সংকটে থাকা দেশের জন্য মিশ্র বাজার ব্যবস্থা বেশি নৈতিকতাপূর্ণ।

৬. সরকারি: সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সবরকম অনৈতিক ব্যবসা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ, বাজার সম্প্রসারণ, মূল্য স্থিতিস্থাপকতা বজায় রেখে অর্থনীতির চাকাকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সচল রাখাই সরকারের উদ্দেশ্য। সব কিছুই যেহেতু, সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত তাই সরকারের কর্মকাণ্ডে যদি অর্থের অপচয় না হয় এবং নৈতিক বিবেচনায় তা পরিশুদ্ধ হয় তবে রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব। রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক হিসেবে সব কর্মকাণ্ডেই সরকারের হস্তক্ষেপ আইনসিদ্ধ। রাষ্ট্রীয় আদর্শ বাস্তবায়ন ও মানবকল্যাণই যখন সরকারের উদ্দেশ্য, তাই রাষ্ট্রের উচিত নৈতিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করা। যেসব বিষয়কে নৈতিক অর্থনীতি গড়ার হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয় সেগুলো যেমন: আর্থিক নীতি, সরকারি বাজেট প্রণয়ন, মুদ্রানীতি, ব্যাংক হার নিরূপণ, বাণিজ্য হার, মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যাংক সুদের হার নির্ধারণ, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ, সরকারি ব্যয় নিরূপণ, বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়ন, অর্থ বাজার ও মূলধন বাজারের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, করপাত ও করঘাত সংশোধন ইত্যাদি। সরকারের যদি সদিচ্ছা না থাকে তবে অর্থের ও সম্পদের অপচয় ঘটে। যেমন: আমানতের সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরো বিশ্লেষণাত্মক হওয়া। পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশের নারীর গতিময়তা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত, ব্যবসা-বাণিজ্য করার সক্ষমতাও অনেকের নেই। তাই নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেয়া অবশ্যই নৈতিকতাপূর্ণ।

জার্মান অর্থনীতিবিদ Peter Koslowsk-র মতে, অধিকাংশ লোকের "সেল্ফ ইন্টারেস্ট" যদি যৌক্তিকভাবে মিটানো যায় তবেই তা নৈতিক অর্থনীতি। অর্থশাস্ত্রের জনক "অ্যাডাম স্মিথের" ওয়েলথ অব নেশনস উদ্ধৃত করে পিটার যুক্তি দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগের সাথে দায়িত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমন্বয় রয়েছে। তবে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা নৈতিক অর্থনীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজনৈতিক অর্থনীতি বাজার অর্থনীতির সামাজিক, আইনি ও প্রতিষ্ঠানিক গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করে (মূল্য পদ্ধতি, বাজার ইন্টারেকশান, চাহিদা ও যোগান, লাভ-ক্ষতি, মালিকানা, চুক্তি, অধিকার, ন্যায়-বিচার) অন্যদিকে, নৈতিক অর্থনীতি এসব প্রতিষ্ঠানের ন্যায়বিচারের নৈতিক নিয়মকানুন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করে।

পিটার কোসলোস্কি 'ইথিক্যাল ইকোনমি'র গোড়াপত্তন করেন। তিনি ১৯৫২ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত অর্থনীতি ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেছেন।

কসলোস্কির বিশ্লেষণ তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:

১. অর্থনীতির নৈতিক পূর্বানুমানের তত্ত্ব
২. নৈতিকতার অর্থনীতি
৩. দ্রব্যাদির অর্থনৈতিক ও নৈতিকতা এবং সংস্কৃতির গুণগত মূল্য।

নৈতিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নের জন্য তিনটি প্রয়োজনীয় কারণ "কসলোস্কি" উল্লেখ করেছেন।

১. সচেতনতা বৃদ্ধি করা: অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বর্ধিত সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং তাদের নৈতিক জবাবদিহিতা প্রয়োজন।

২. কৌশলগত অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের মানবিক বিষয়সমূহ এবং অর্থনৈতিক নেতাদের জবাবদিহিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুনঃআবিষ্কার করা।

৩. সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিশ্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা প্রতিহত করা প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে, কসলোস্কি ইথিক্যাল ইকোনমিকে বিশ্লেষণ করে তাকে আধুনিক-উত্তর অর্থনীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন:

'Close juxtapose of economics and ethics enables to enjoy loving relationship and self-responsibility that enables to live in freedom by ethical economy.'